IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ইতিহাস

স্বদেশ জানা

গবেষক

সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশ:

ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের সাফল্য লাভের অন্যতম উপায় ছিল বিকেন্দ্রীকরন। সেজন্য একান্তভাবে প্রয়োজন ভারতের অঙ্গরাজ্য গুলিতে এই বিকেন্দ্রীকরণ শাসন প্রতিষ্ঠা করা। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বা পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দাবি রাখে। অন্য অনেক রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেরও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার একটি সুনির্দিষ্ট ইতিহাস আছে।১৮৭০ পল্লী চৌকিদার আইন ১৮৮৫ বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইন ১৯১৯ বঙ্গীয় গ্রামীন স্বায়ত্তশাসন আইন প্রভৃতির মাধ্যমে ইংরেজ আমলে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস আমলের পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সুস্পষ্ট রূপ নিতে শুরু করে। ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলবন্ত রাও মেহেতার কমিটির সুপারিশ অনুসারে প্রথম পঞ্চায়েত আইন প্রণয়ন করে। ১৯৬৩ সালেও আরও একটি আইন তৈরি হয়। ১৯৭৭ সালে বাম সরকার ক্ষমতায় এলে ১৯৭৮ সালে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাম আমলে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আরো বেশি সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে।তৃণমূল সরকারের আমলে মহিলাদের জন্য ৫০% আসন সংরক্ষণ দেখা যায়। অন্যদিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্রমবর্ধমান হিংসা ও অশান্তির একাধিক চিত্র দেখা যায় ।

সূচক : বিকেন্দ্রীকরণ, পঞ্চায়েত আইন,ইংরেজ আমল,কংগ্রেস আমল, বামফ্রন্ট আমল, তৃণমূল কংগ্রেস আমল।

বাংলাকে কেন্দ্র করে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত এবং পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতবর্ষ তার অধীনস্ত হয়। ফলে ভারতের পাশাপাশি বাংলাতেও ব্রিটিশ শাসন দৃঢ় হওয়ার সাথে সাথে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা বা স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা খর্ব হয়। ঔপনিবেশিক শাসনের করাল গ্রাসে বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পূর্ণ ধবংস করার পাশাপাশি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্বৈরতন্ত্র কায়েম হয়। ফলে গ্রামীণ প্রজাতান্ত্রিক কাঠামো সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। এক্ষেত্রে দু – একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ বাদ দিলে তেমনভাবে স্থানীয় গ্রামীণ সরকার গঠনের উদ্যোগ প্রথমদিকে ইংরেজ শাসনে দেখা যায়নি।তবে ১৮৪২ সালে একটি আইন করে বাংলায় পৌরসভা গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর পরবর্তীকালে ১৮৫০ এবং ১৮৫৬ সালে দুটি আইন প্রণয়ণ করেছিল। এই আইনে পৌরসভা গঠনের কথা থাকলেও প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল চৌকিদারী বা পুলিশ কর আদায় এবং ইউরোপীয়দের পৌর পরিষেবা সুনিশ্চিত করা। ফলে ইংরেজ সরকারের উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা, সদিচ্ছার অভাব একে ব্যর্থতার পর্ববাসিত করে।

*পল্লী চৌকিদারী আইনঃ (১৮৭০)

১৮৭০ সালে চৌকিদারী আইন পাশ হয়। এরপর থেকে গ্রামবাংলার স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থাগুলি নতুন যাত্রা শুরু করে। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামাঞ্চলে পুলিশি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা। চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সদস্যরা গ্রামবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন না। জেলা ম্যাজিস্টেট তাদের নিযুক্ত করতেন। সাধারণের উন্নয়নের পরিবর্তে এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র গ্রামাঞ্চলের অপরাধ নিবারণ করা। এই আইনে ৬০টির বেশী বাড়ি রয়েছে এমন কোনো গ্রামে পঞ্চায়েত নিয়োগের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। নূন্যতম ৫ জন সদস্য নিয়ে পঞ্চায়েত গঠিত হত। গ্রামে আইনশৃঙখলা রক্ষা করাই ছিল পঞ্চায়েতের কাজ।১

এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় স্থানীয় সরকারের একক হিসাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা খুব একটা ফলপ্রসু হয়নি।

*বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনঃ (১৮৫৫)

চৌকিদারী আইনের ব্যর্থতা ও রিপন প্রস্তাবের পর ১৮৫৫ সালে প্রথম একটি গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ হয়। ১৮৫৫ সালের বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে লর্ড মেয়োর চিন্তাভাবনাকে অর্ন্তভুক্ত করেছিলেন। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার অ্যাশ্লে ইডেন (Ashle Eden)। এই আইন প্রনয়ণের পেছনে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের তিনটি উদ্দেশ্য ছিল।২

(ক) প্রাদেশিক সরকারকে প্রশাসনিক কাজের কিছু দায়ভার থেকে মুক্ত করা

(খ) ঔপনিবেশিক শাসকরা নাগরিকদের ওপর করের যে বোঝা চাপিয়েছিলেন এবং নাগরিকদের মধ্যে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল স্থানীয় সরকার গঠন করে ঔপনিবেশিক শাসকরা তাদের সাথে একপ্রকার সমঝোতা করতে চেয়েছিল।

(গ) স্থানীয় সরকার দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যয়ের ওপর নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কিছুমাত্রায় বৃদ্ধি করা।

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইনে ১৪৯ টি অনুচ্ছেদ এবং ৪ টি তপশিল ছিল এবং সমগ্র রির্পোটটি চারটি অংশে বিভক্ত ছিল। আইনের প্রথম ভাগে নতুন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসাবে জেলাবোর্ড স্থানীয় বোর্ড এবং ইউনিয়ন কমিটি গঠন ও পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। আইনের দ্বিতীয় ভাগে, এই প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আইনের চতুর্থ তথা শেষ অংশে সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং বিবিধ বিষয় অর্ন্তভুক্ত হয়েছিল।

রিপণ প্রস্তাবে স্থানীয় বোর্ডগুলি বেসরকারী প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠনের কথা বলা হলেও ঔপনিবেশিক আধিকারিকরা নিয়ন্ত্রণ ছাড়বার বিষয়ে যথেষ্ট অনাগ্রহী ছিল। এ প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করা যেতে পারে – There was no denying the fact that its (Local Self Government) growthwas dwarfed by official neglect and apathy …… In March 1914, I moved a Resolution recommending that the President of Districts and Local Boards be elected and that a Local Government Board should be created in each Province. The Resolution was opposed by Government and was lost …৩

*বঙ্গীয়গ্রামীণস্বায়ত্তশাসনআইনঃ(১৯১৯)

১৯১৯ সালে বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ হয়। এই আইনে গ্রামাঞ্চলে চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাথে ইউনিয়ন কমিটিকে যোগ করে ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন অনুসারে ত্রি–স্তরীয় স্থানীয় সরকারের কথা বলা হয়েছিল –

(ক) গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ড (খ) মহকুমা স্তরে স্থানীয় বোর্ড (গ) জেলা বোর্ড। এই আইনে ইউনিয়ন বোর্ডকে গ্রামের প্রশাসন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন পৌর এলাকা বাদ দিয়ে সমগ্র বাংলায় প্রযুক্ত হয়েছিল।[৪]তবে ১৯১৯ সালের এই আইনে সার্বজনীন ভোটাধিকারদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।এরা নির্বাচমণ্ডলী দ্বারা নির্বাচিত হতেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যকাল ছিল চার বছর। নির্বাচিত সভাপতি বোর্ডের মিটিং পরিচালনা করতেন। আইনে এই বোর্ডের ওপর যেসমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল তা হল –৫(ক) গ্রামের দফাদার ও চৌকিদারদের উপর নিয়ন্ত্রণ (খ) গ্রামের জনস্বাস্থ্য (গ) গ্রামের মেলা পরিচালনা (ঘ) প্রয়ঃপ্রণালী ও নিষ্কাশনের কাজকর্ম (ঙ) স্থানীয় স্তরে সরকারী তথ্যের সরবরাহ, স্বাস্থ্য এবং উন্নয়নের কাজকর্ম সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করা (চ) জন্ম এবং মৃত্যুর নথিভুক্তকরণ কর্মসূচী (ছ) কুটির শিল্পের বিকাশ (জ) রাস্তাঘাট মেরামতি এবং নির্মাণ (ঝ) প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন রক্ষণাবেক্ষণ পরিচালনা (ঞ) স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ইত্যাদি।

১৯১৯ সালের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইনে গ্রামের আইনশৃঙখলা রক্ষার দায়িত্ব ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে দেওয়া হয়েছিল। উপরন্তু ইউনিয়ন বোর্ডকে গ্রামীণ স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা ও কর আরোপের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং পূর্বের ইউনিয়ন কমিটির সাপেক্ষে ইউনিয়ন বোর্ড ছিল অনেক স্বাধীন। ইউনিয়ন বোর্ডকে কোনো রূপেই জেলা বা স্থানীয় বোর্ডের এজেন্ট বলা চলে না। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে প্রতিটি ইউনিয়ন বোর্ডে ৮ থেকে ১০ টি গ্রাম নিয়ে গঠিত হত। প্রতিটি ইউনিয়ন বোর্ডের গড় জনসংখ্যা ছিল ৮০০০।সরকার ও ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের বিষয়ে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিল। স্বভাবতই এরফলে ১৯৩৬ -৩৭ সালের মধ্যে বাংলায় ৫০০০ ইউনিয়ন বোর্ড গড়ে উঠেছিল।৬

১৯৩৫ সালে বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন (১৯১৯)কে সংশোধন করা হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য সংশোধনীগুলো ছিল – (ক) এই সময় ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যকাল দুবছর থেকে বাড়িয়ে চারবছর করা হয় (খ) ভোটাধিকার সম্প্রসারণ করা হয় (গ) ইউনিয়ন বোর্ডকে কিছু অতিরিক্ত কাজ অর্পণ করা হয়েছিল। যেমন, গ্রামে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের দায়িত্ব ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে অর্পণ করা হয়েছিল।

১৯৩৮ সালের পর থেকে স্থানীয় সরকারের বিকাশের ঢেউ স্তিমিত হয়ে পড়ে। এই সময় গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি বাংলার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কংগ্রেসের প্রাধান্যের পরিবর্তে প্রথম কৃষক প্রজা পার্টি এবং পরবর্তী সময়ে মুসলীম লিগের মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুটি সরকারই বাংলায় স্থানীয় সরকারে ইতিবাচক ভূমিকা নিতে পারেনি। বরং এই সময়ে ভারতের অনান্য কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে স্থানীয় সরকার বিষয়ক একাধিক আইন পাশ হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে পুনরায় সংশোধন করা হয়, ১৯১৯ সালের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইনকে। এই সময় ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছিল।৭

*কংগ্রেস আমলে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাঃ

১৯৫০ সাল থেকে বাংলায় পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে পরীক্ষামূলক পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছিল কয়েকটি ব্লক এলাকায়। পরীক্ষামূলকভাবে গঠিত পঞ্চায়েতের কোন আইনী বৈধতা ছিল না। ৭০০-৮০০ লোক বাস করে এমন একটি গ্রাম নিয়ে পঞ্চায়েত গঠিত হয় পরীক্ষামূলকভাবে। গ্রামবাসীরা এক জায়গায় মিলিত হয়ে হাত তুলে ভোট দিয়ে পঞ্চায়েতের নয়জন সদস্য ও একজন সভাপতি নির্বাচিত করত। পরীক্ষামূলক এই পঞ্চায়েতগুলি ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে থেকে কাজ করত।

বলবন্ত রাও মেহেতা কমিটির সুপারিশ এবং পরীক্ষামূলক পঞ্চায়েতের ভূমিকাকে কাজে লাগিয়ে ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাধীনতা–উত্তর যুগে প্রথম পঞ্চায়েত আইন প্রণয়ণ করে। এই আইন অনুসারে ইউনিয়ন বোর্ডের স্থলে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং অঞ্চল পঞ্চায়েত এই দ্বি–স্তর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলির ভৌগলিক সীমানা পূর্বের ইউনিয়ন বোর্ডের মতই ছিল এবং এগুলি ছিল উপরের স্তর যার অধীনে ছিল সরাসরি নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত।এরপর ১৯৬৩ সালের জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী ব্লক পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ যুক্ত হয়। ১৯৬৩ সালের আইনের উদ্দেশ্য ছিল উন্নয়নের কাজে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জড়িত করা এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।১৯৫৭ এবং ১৯৬৩ সালের আইন দুটি প্রবর্তনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ও প্রশাসন একটি নতুন রূপ ধারণ করে। এই আইন দুটির ফলে পশ্চিমবঙ্গের চার – স্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা – গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পরিষদ গড়ে ওঠে।

১৯৫৭ এবং ১৯৬৩র পঞ্চায়েত আইন বিভিন্ন ত্রুটিগুলি বারবার সামনে উঠে আসছিল। যুক্তফ্রন্টের সরকারের পঞ্চায়েত দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বি.বি.দাস পঞ্চায়েতের আগের আইনগুলিকে সমালোচনা করে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নতুন পঞ্চায়েত আইনের উদ্দেশ্য ব্যাখা করেন। প্রস্তাবিত বিলে চারস্তর পঞ্চায়েতের পরিবর্তে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কথা বলা হয়েছিল। তবে ওই বিল আইনে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭০ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের মন্ত্রীসভার মন্ত্রী ছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১৯৫৭ এবং ১৯৬৩ এর পঞ্চায়েত আইনকে বাতিল করে নতুন একটি পঞ্চায়েত আইন, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩রাজ্য বিধানসভায় পাশ হয়।এই আইনে চারস্তর পঞ্চায়েতের পরিবর্তে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। পাশাপাশি তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং মহিলাদের মনোনয়নের সংস্থান ছিল এই আইনে। কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করা, নিচুস্তরের সঙ্গে উঁচুস্তরের সম্পর্ক স্থাপন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্দিষ্ট ভূমিকা, নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং আমলাতন্ত্রের মধ্যে স্পষ্ট ক্ষমতা বিভাজনের রূপরেখা এই আইনকে পঞ্চায়েত গঠনের প্রশ্নে ভিন্ন মাত্রা প্রদান করেছে।

রঞ্জিত চৌধুরী কংগ্রেস শাসনকালের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে গিয়ে লক্ষ করেছিলেন যে স্বাধীনতার আগে পঞ্চায়েত মূলত উঁচু জাতের এলিট শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নেতৃত্বের কাঠামো অনেক বেশী বিস্তৃীত হয়েছিল। পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো গ্রামের উচু জাতের এলীট শ্রেণীর হাতে থাকলেও ধীরে ধীরে গ্রামের সাধারণ মানুষদেরও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।৮

*বাম আমলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাঃ

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহারে দ্রুত পঞ্চায়েত নির্বাচন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া পঞ্চায়েতের হাতে গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। ফলে ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৮ সালে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন এবং গ্রামীণ কারিগরদের অধিকার স্থাপনের হাতিয়ার হল পঞ্চায়েত ব্যবস্থা।৯ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে গ্রামীণ জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করবার মধ্য দিয়ে আমলাতান্ত্রিক শক্তিকে ধবং করার কথা বলা হয়।কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রণ্টের মতন বাম সরকারকে ক্ষমতায় থাকতে দেবে না বলে ধারণা ছিল। এই অবস্থায় বামদলগুলো দ্রুত পঞ্চায়েত নির্বাচন করে তৃণমূল স্তরে সাংগঠনিক ক্ষমতা বিস্তার করতে চেয়েছিল। অর্থাৎ পঞ্চায়েতকে তৃণমূল স্তরের দলীয় সংগঠন বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করেছিল। আমলাতন্ত্রের উপর কোনো আস্থা ছিল না বামদলগুলির। তাই আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য হ্রাস করে স্থানীয় সরকারের বিকাশের উপর জোর দিয়েছিল। ১৯৭৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি.পি.আই (এম) দলের গ্রামাঞ্চলে দলীয় সংগঠন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়েছিল।১০

বাম আমলে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে মূলত সিপিআই (এম) দলের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতির উপর ভিত্তি করে। পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরে রয়েছে পরিচালন কমিটি। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ পরিচালিত হয় যথাক্রমে দলের লোকাল কমিটি, জেনারেল কমিটি এবং জেলা কমিটিগুলোর মাধ্যমে। প্রতিটি স্তরেই দলের পরিচালন কমিটি পঞ্চায়েতের কাজে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিত। যদিও নির্বাচিত সদস্যদের সুপারিশগুলো দল বিবেচনা করত।১১

বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের দ্রুত সাংগঠনিক বিকাশের জন্য বিশেষ নজর দিয়েছিল যেমন–পঞ্চায়েত অফিস তৈরী করা, কর্মী নিয়োগ করা, প্রয়োজনীয় আইন সশোধন, মানবসম্পদের বিকাশ সাধন করা প্রভৃতি। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং পঞ্চায়েত কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে কল্যাণীতে পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন সংস্থা। এটি উচ্চ ও মধ্যবর্তী স্তরের পঞ্চায়েত কর্মকর্তা এবং আধিকারিকদের মূল প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করছে। পঞ্চায়েত আইন বিভিন্ন সময় সংশোধন করে গ্রামীণ উন্নয়নের সমস্ত কর্মসূচীগুলোই পঞ্চায়েতের হাতে অর্পণ করা হয়েছিল। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের কাজের ক্ষেত্রগুলিকে প্রধান ৬টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়–

(ক) গ্রামীণ পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজকর্ম যেমন-গ্রামের রাস্তাঘাট, প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুল নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা।

(খ) গ্রামের মানুষের নূন্যতম চাহিদা পূরণ সংক্রান্ত কাজকর্ম যেমন–পানীয় জল সরবরাহ, গৃহনির্মাণ, পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ কর্মসূচী, মা এবং শিশু উন্নয়ন কর্মসূচী।

(গ) গ্রামের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সংক্রান্ত কাজকর্ম।

(ঘ) গ্রামের মানবসম্পদ এবং পার্থিব সম্পদ বিকাশ সংক্রান্ত কাজকর্ম।

(ঙ) জন্ম – মৃত্যু ইত্যাদি তথ্যের নথিভুক্তকরণ সংক্রান্ত কাজকর্ম।

(চ) প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার যেমন – ভূমিসংস্কার কর্মসূচী রূপায়ণ। এর অন্যতম কাজ হল উদবৃত্ত জমি চিহ্নিত করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা এবং ভাগচাষীদের নাম নথিভুক্ত করা। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধনে পঞ্চায়েতের ইতিবাচক ভূমিকার ফলে গ্রামবাংলার আর্থ সামাজিক কাঠামোতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল।

পঞ্চায়েত আইনকে সংশোধন করে গ্রামসভার পাশাপাশি গ্রামসংসদ এবং গ্রাম উন্নয়ন সমিতি প্রতিষ্ঠা করার ফলে গ্রামীণ জণগনকে আরও বেশী মাত্রায় স্থানীয় সরকার বা পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণকরার সুযোগ পায়। গ্রামীণ উন্নয়ন ও বামফ্রন্টের তৃণমূল স্তরে রাজনৈতিক কাঠামোকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা দেওয়া সম্ভব হয়।

*তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাঃ

বামপন্থীরা পঞ্চায়েতকে উন্নয়ন ও স্থানীয় সংগঠন গড়ে তোলবার হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায়অর্থাৎ সর্বোদয় ভাবনা দ্বারা পঞ্চায়েতকে পরিচালনা করতে চায়। ২০০৮ সালে তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তাহারে যে বিষয়গুলি স্থান পেয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল –

(ক) গ্রামবাংলা সহ রাজ্যের সর্বত্র সি.পি.এমের একদলীয় প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং বিরোধী শক্তির রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত করা।

(খ) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির যথাযথ গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতায় পাঞ্জাবের কাছাকাছি পৌছানো। উৎপাদিত ফসলের সংরক্ষণ ও যথাযথ বিপণনের ব্যবস্থা করা হয়। কমদামে বীজ, সার, কীটনাশক, বিদ্যুৎ জলসহ কৃষি সরঞ্জাম দিয়ে চাষীদের উদ্‌বুদ্ধ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। যাতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্প বিকাশের ভিত্তি প্রশস্থ হয়। এক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েতের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করতে চায়।

(গ) খেত মজুরের নূন্যতম মুজুরি ও ২৭০ দিনের কাজ সুনিশ্চিত করা।

(ঘ) দ্রুত ত্রুটিমুক্ত বিপিএল তালিকা প্রকাশ করে দারিদ্রসীমার নীচে গ্রামীণ জনসংখ্যাকে চিহ্নিত করা। কেন্দ্রীয় সরকারের ১০০ দিনের কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আরও অতিরিক্ত ১০০ দিনের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করা।

(ঙ) দলীয় আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে গ্রামোন্নয়নের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ সৃষ্টি করা। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গণ আদালতে কৈফিয়ত দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

(চ) ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কাজকর্ম পরিচালনা, পরিকল্পনা, কাজের বরাত এবং আর্থিক হিসাবপত্র পেশের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইগভর্নেন্স চালু করা।

(ছ) গ্রামের ঐতিহ্যবাহী লোক সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনে পঞ্চায়েতের সক্রিয় ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপের কথা বলেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

(জ) কৃষি কৃষকের উন্নতির লক্ষ্যে ভূমিসংস্কারের অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ভূমিহীনদের সিলিং বহির্ভূত জমি প্রদান করা। অনথিভুক্ত বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত করা এবং ক্রমে ক্রমে তাদের জমির স্বত্ব প্রদান করা। এ কাজে পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনী ইস্তাহারে তৃণমূল কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল।১২

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতগুলিতে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করার ফলে মহিলারা পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে অংশগ্রহণ করার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। ফলে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও স্থানীয় সরকারের সম প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পায়। অন্যদিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ওবিসি(এ) শ্রেণীতে সংরক্ষিত করার ফলে পঞ্চায়েতগুলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব পায়। এরফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য আসে। সম্প্রতি রাজ্য সরকার ১৯৭৩ সালের আইন পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। এই আইনে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান, সমিতিতে সহকারী সভাপতি এবং জেলা পরিষদে সহকারী সভাপতির ভূমিকার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি নতুন আইনে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি, ব্লক সংসদ, এবং জেলা সাংসদ অবলুপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা প্রস্তুত হবে।তৃণমূলের আমলে অভিরূপ সরকারের নেতৃত্বে চতুর্থ রাজ্য অর্থকমিশন গঠন হলেও সেই কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা হয়নি। পঞ্চায়েতগুলিতে কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে একাধিক দুর্নীতির বারবার অভিযোগ এলেও দুর্নীতির বন্ধের জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ দেখা যায়নি।

তৃণমূল সরকারের আমলে জেলা উন্নয়ন মিটিং এ পঞ্চায়েত প্রতিনিধি বিশেষত বিরোধী শিবিরে থাকা পঞ্চায়েত সদস্যদের বাদ দিয়ে জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, বিডিও ও অনান্য আধিকারিকদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত করে। মূলত স্থানীয় সরকারগুলিকে গুরুত্ব হ্রাস, আমলাতন্ত্র নির্ভর প্রশাসন, জনগণের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের বাতুলতা প্রভৃতি। তাছাড়া ক্ষমতায় আসার পর রাজ্য সরকার উত্তর ২৪ পরগণা, নদীয়া, এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় জেলা পরিষদের হাত থেকে আর্থিক ক্ষমতা কেড়ে জেলাশাসকের হাতে প্রদান বিকেন্দ্রীকরণ ও জনগণের অংশগ্রহণ ও স্থানীয় সরকারগুলির প্রতি সরকারের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। তৃণমূল

কংগ্রেস পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে স্থানীয় সরকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার পরিবর্তে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যেও এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। ২০১৭ সালে জাগো বাংলার উৎসব সংখ্যায় কেন্দ্রের শত বঞ্চনাতে ও পঞ্চায়েতে দেশে আমরাই মডেলশীর্ষক প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে গ্রাম উন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা প্রতিফলিত হয়েছে।১৩ কিন্তু পঞ্চায়েত মন্ত্রীর ভাবনাতে পঞ্চায়েতকে স্থানীয় স্তরের সরকার হিসাবে গড়ে তোলবার কোনো ইঙ্গিত মেলেনি।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট তৃণমূল সরকারের আমলে ২০১৩ ও ২০১৮ পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে একাধিক বিষয় সরিয়ে রেখে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পঞ্চায়েতগুলি স্থানীয় সরকার নয় বরং উন্নয়নে শরীক ছিল রাজ্য সরকারের। পঞ্চায়েতের কোনো অর্থনৈতিক স্বাধিকার ছিল না, আমলারা অর্থাৎ বিডিও, এস. ডি.ও, ডি.এম ছিল এর মূল চালিকা শক্তি। গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির কাজে বিডিও এবং পরিষদের কাজে ডি.এম এর প্রতিনিয়ত হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণের ফলে জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা বহুলাংশে সঙ্কুচিত হয়। পঞ্চায়েতগুলিতে জনগণের শাসনের পরিবর্তে আমলা নির্ভর ও নিয়ন্ত্রিত শাসনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

১।বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, তথ্যের আলোকে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন, গ্রন্থমিত্র পৃ – ২১।

২।S.K Mukherjee, Local Self Government in West Bengal, Das Gupta and Co, Calcutta, 1974, P-8

৩।Sir Surendranath Banerjee, A Nation in Making, p-275.

৪।বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন,২০১৩, গ্রামবাংলার রায়, পৃ – ৪৩১।

৫।The Bengal Village Self Government Act 1919, Section 17A and 17B, Legislative Department, West Bengal Government Press, Alipure.

৬।Prabhat Dutta, Panchyat, Rural Development and local Authority, The West Bengal Experience, Dasgupta and Co.; Kolkata, 2001, p.28.

৭।বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০১৩, গ্রামবাংলার রায়, পৃ – ৪৩১।

৮।Ranjit Chaudhuri, Panchayats and Interest Groups : study of a Bengal Village, Economic weekly, Vol. XVI, 1967, No. 38, September 19, pp. 1529-1530

৯।Promod Dasgupta, Desh Hitaishi, 1978, April 7.

১০।Buddhadeb Ghosh and Girish Kumar, State Politics and Panchayat in India, Monohar, New Delhi, 2005.

১১।The West Bengal CPI(M) States Committee Directives on Panchdayats 31January, 1994, Kolkata, unpublished pp. 3-11.

১২।বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ.- ১১৫।

১৩।সুব্রত মুখোপাধ্যায়, কেন্দ্রের শত বঞ্চনাতেও পঞ্চায়েতে দেশে আমরাই মডেল, জাগো বাংলা, উৎসব সংখ্যা, ২০১৭।